Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলমিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত আরবী

রোলঃ 20202349216

১২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত আরবী

রোলঃ 20202349216

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত আরবী, আইডিঃ 20202349216 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

নুসরাত আরবী

আইডিঃ 20202349216

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

মানবজীবনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা 6

বালা-মুসিবত কখন পরীক্ষা, কখন শাস্তি 7

কি কি কারণে মুমিনদের উপর বালা-মুসিবত আসতে পারে 8

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য 10

ধৈর্য ধারণে কুরআনে বর্ণিত পুরষ্কার 12

নবী-রাসুল ধৈর্যের পরীক্ষা ও সবর 15

১. মহানবীর ধৈর্যশীলতা 16

নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর 17

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির ধৈর্য্য 18

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর 18

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ 19

কিভাবে পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে পারি 23

কীভাবে ধৈর্য বাড়াতে পারি 24

বিজয়ের জন্য চাই ধৈর্য ও সংহতি 26

যে দু'আয় সহজ হবে ধৈর্য্যধারণ 27

বালা মুসিবত কামনা করা অনুচিত 28

রেফারেন্স 30

বালা-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করার গুরুত্ব ও ফজিলত।

ধৈর্য এমন একটি গুণ, যা ব্যতীত মানুষ দ্বীনি ও দুনিয়াবি কোনো ক্ষেত্রেই উন্নয়ন করতে পারে না। এই পার্থিব জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে। এখানে আমাদের জীবনে ভালোমন্দ আসে রাতদিনের অনন্তর পালাবদলের মতো। এখন চোখে পৃথিবীর আলো, তো একটু পরেই রাজ্যের অন্ধকার। কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয় এখানে- স্থায়ী নয় এই জীবন, এই ঘর ও সংসার। এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বলে কিছু নেই, তবে ব্যতিক্রম কেবল সেই রহস্যময় ব্যক্তিত্ব, যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে তার প্রভুর সন্তুষ্টির আয়োজনে, এবং তার সাথে মিলিত হবার প্রাণান্তকর পথচলায়। আর যখন দুঃখ- কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন সে ধৈর্যকে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের উপকরণ হিসেবে যথাযথভাবে কাজে লাগায়, এ কারণে যা-কিছুই ঘটুক আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে গ্রহণ করে সে সন্তুষ্ট থাকে, এবং এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে অন্তরে শান্তি অনুভব করে। এটা হচ্ছে একজন প্রকৃত ও সফল মুমিনের জীবনধারা।মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। পবিত্র কোরআনে স্থানে স্থানে মহান আল্লাহ নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন।ধৈর্য ধারণকারীর সাফল্য সুনিশ্চিত, কারণ আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণকারীর সঙ্গে থাকেন; আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যার সঙ্গে থাকবেন, তার সফলতা অবধারিত।

মানবজীবনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে আল্লাহর কোনো-না-কোনো আদেশ পালন করতে হয়, না-হয় আল্লাহর কোনো-না-কোনো নিষেধ মেনে চলতে হয়, অথবা কখনো আল্লাহর নির্ধারিত অপ্রসন্ন ভাগ্য মেনে নিতে হয়, কিংবা আল্লাহপ্রদত্ত নিআমাতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হয়। উল্লিখিত প্রতিটি পরিস্থিতিতেই ধৈর্যের প্রয়োজন। আর তাই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মানবজীবনে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জীবনে অনুকূল বা প্রতিকূল যা-কিছুই ঘটুক না কেন, সর্বাবস্থাতেই ধৈর্যের প্রয়োজন।

যে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য-নিরাপত্তা-ক্ষমতা-সম্পদ এবং শারীরিক সকল চাহিদা পূরণে সমর্থ, তার এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা চিরকাল থাকবে না। তাকে সতর্ক থাকতে হবে, তার এই সৌভাগ্য যেন তাকে উদ্ধত, অহংকারী এবং উদাসীন করে না দেয়, যা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দের। সময়, সম্পদ ও শক্তির সবটুকু দৈহিক ভোগের পেছনে ব্যয় করাটা উচিত হবে না। কারণ, অতিভোগ শেষ পর্যন্ত দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাকে যাকাত-সাদাকার মাধ্যমে আল্লাহর প্রাপ্য পরিশোধের প্রতি যত্নবান হতে হবে, অন্যথায় আল্লাহ তার সৌভাগ্য ছিনিয়ে নেবেন। অবৈধ (হারাম) পথে অর্থ ব্যয়ে সংযত থাকতে হবে এবং অপছন্দনীয় (মাকরূহ) পথে অর্থ ব্যয়ে সতর্ক হতে হবে।

এই যাবতীয় কাজের জন্য দরকার ধৈর্য; আর বিশ্বাসে শক্তিমান মুমিন (সিদ্দিকীন) ব্যতীত স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে অন্যদের পক্ষে ধৈর্যে অটল থাকা সম্ভব নয়।

বালা-মুসিবত কখন পরীক্ষা, কখন শাস্তি

যখন কেউ আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন কিংবা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, তখন সেই বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে আহত হন, কোনো মুহাজির যখন হিজরত করতে গিয়ে সম্পত্তি হারান, সুন্নতের অনুসরণ করতে গিয়ে বা ইসলামের বিধান মানতে গিয়ে যখন কারও চাকরি চলে যায়-তখন এ ধরনের বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। যারা এ ধরনের বিপদে সবর করবে, তারা উত্তম বিনিময় পাবে। আর যারা অসন্তোষ প্রকাশ করবে, তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে।

গুনাহের কাজ করতে করতে যখন কেউ দুর্দশার শিকার হয়, তখন এটি আযাব। উদাহরণস্বরূপ, মদ বা অন্যকোনো নেশাদ্রব্য গ্রহণের কারণে কেউ যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তা আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। এমতাবস্থায় সাথে সাথে গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। তাওবা ও ইসতিগফার করে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর না হলে জেনে রাখা উচিত, কিয়ামাতের শাস্তি এর চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ, যন্ত্রণাদায়ক আর অসহ্য হবে।

অনেক সময় বিপদ-আপদের সাথে নেকির কাজ বা গুনাহের কাজের সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন কেউ রোগাক্রান্ত হলো, সন্তান হারাল কিংবা ব্যবসায় ক্ষতির শিকার হলো। এমতাবস্থায় একজন মুসলিমের উচিত নিজের আমলের পর্যালোচনা করা। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলের ফলস্বরূপ বিপদ দেওয়া হয়। অথবা, অনেক সময় আল্লাহ বান্দার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে বিপদ দেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَط فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشْيَ النَّاسِ بُوسًا

فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَط هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَط فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَط وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَط

' কিয়ামাতের ময়দানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সুখী ছিল এমন এক জাহান্নামী ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে অল্প সময় ঢুকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও দুনিয়াতে সুখ- শান্তিতে ছিলে? তুমি কি কখনও দুনিয়ার নিয়ামাত পেয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম! হে আমার রব! আমি কখনও দুনিয়াতে শান্তি পাইনি। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সর্বাধিক কষ্ট ও অশান্তিতে ছিল এমন এক জান্নাতি ব্যক্তিকে আনা হবে তারপর তাকে অল্প সময়ের জন্য জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও অভাব অনটনে ছিলে? সে আল্লাহর কসম করে বলবে, না, আমি কখনও কোনো অভাব-অনটনে বা কষ্টে ছিলাম না।

কি কি কারণে মুমিনদের উপর বালা-মুসিবত আসতে পারে

বিপদাপদ মানুষের জীবনের অংশ। এটি কখনো কখনো মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে, আবার কারো ক্ষেত্রে অকল্যাণও হয়। যারা মুমিন তাদের ওপরও মাঝে মাঝে বিপদ আসে। যারা কাফের, তাদের ওপরও বিপদ আসে।

তবে মুমিন যদি বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, তবে তার জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো কখনো হতাশ হয়ে বলে বসে, আমি তো সাধ্যমতো মহান আল্লাহর ইবাদত করার চেষ্টা করি, তাহলে আমার ওপর কেন এত পরীক্ষা আসে! নিম্নে এর সম্ভাব্য কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হলো—

i. পরীক্ষাস্বরূপ

মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদের কখনো কখনো পরীক্ষা করেন, পরীক্ষা করার জন্যই তাদের বিভিন্ন রকম বিপদে পতিত করেন। তারপর তাদের ঈমানের অবস্থা যাচাই

করেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, ‘মানুষ কি মনে করে যে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি।

ফলে আল্লাহ জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে আর এও জেনে নেবেন কারা মিথ্যা বলে।’ (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ২-৩)

যারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তাদের পুরস্কারের কথাও পবিত্র কোরআনে রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।

যারা, তাদের যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫-১৫৭)

ii. গুনাহ মাফ করার জন্য

মহান আল্লাহ কখনো কখনো বান্দাকে পাপমুক্ত করার জন্য বিপদাপদ দেন। সোনাকে যেমন আগুণে পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করা হয়, তেমনি আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরও বিভিন্ন রকম বিপদ দেন, এর মাধ্যমে তিনি তাদের পাপমুক্ত করেন। যার ঈমান যত মজবুত, তার ওপর বিপদও তত বড় আসে।

হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মুসআব ইবনে সাদ (রহ.) থেকে তার বাবার সূত্রে থেকে বর্ণিত, তিনি (সাদ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বলেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ

তার দ্বিনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে সে জমিনে চলাফেরা করে অথচ তার কোনো গুনাহই থাকে না।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৮)

iii. মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য

মহান আল্লাহ কখনো কখনো তাঁর মুমিন বান্দাদের বিপদাপদ দেন তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আয়েশা (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যেকোনো মুসলমানের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হয় কিংবা তার চেয়েও বেশি ছোট্ট কোনো আঘাত লাগে, তার বিনিময়ে তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।' (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৫৫)

অতএব মুমিনের উচিত, যেকোনো পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা। ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে এর উত্তম প্রতিদানের জন্য দোয়া করা। ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ বিপদকে নিয়ামতে পরিণত করে দেবেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য

প্রিয়জনের মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা, অসুস্থতা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি-এমন বিভিন্ন মানবিক প্রতিকূলতা মোটামুটি দু-রকমের:

১. নিয়ন্ত্রণাতীত দুর্দশা :

ঝড়, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এ-জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেগুলোর পেছনে মানুষের কোনো হাত নেই।

২. আরোপিত দুর্দশা :

অন্যদের হস্তক্ষেপের ফলে সৃষ্ট আপদ। যেমন: অপবাদ, নির্যাতন, বঞ্চনা ইত্যাদি।

নিয়ন্ত্রণাতীত দুর্দশায় আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনগুলো যেরূপ হতে পারে:

১. অসহায়ত্ববোধ, অসন্তোষ, আতঙ্ক এবং অভিযোগ।

২. ধৈর্য প্রদর্শন-তা হতে পারে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিংবা মানবীয় গুণ হিসেবে।

৩. স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া এবং এ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা। প্রকৃতপক্ষে এটা ধৈর্য থেকেও উচ্চতর অবস্থা।

৪. খুশিমনে ও কৃতজ্ঞচিত্তে পরিস্থিতি গ্রহণ করা। এটা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার চেয়েও সমুন্নত অবস্থা; কারণ, এ ক্ষেত্রে সংকটকে অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই পরিস্থিতে নিপতিত হওয়ার জন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

অন্যদের **আরোপিত দুর্দশায়** আমাদের প্রতিক্রিয়ার ধরনগুলো কীরূপ হতে পারে:

১. ভুলে যাওয়া এবং ক্ষমা করে দেওয়ার ইচ্ছে করা।

২. প্রতিশোধ না নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. তাকদীরের লিখন হিসেবে মেনে নেওয়া। যখন এটা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি এই ক্ষতিটা করেছে সে জালিম হলেও, যে মহান সত্ত্বা এই তাকদির লিখেছিলেন তিনি তো জালিম নন। এ রকমের ক্ষতির শিকার হওয়া অনেকটা গরম বা শীতে কষ্ট পোহানোর মতো। এই আপদের সংঘটনকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, আর গরম ও শীতকে অভিযোগ দেওয়া তো প্রলাপের নামান্তর। যা-কিছু ঘটে তাকদীর অনুযায়ী ঘটে, যদিও তা ঘটার বহু পথ ও উপায় থাকে।

৪. অন্যায় আচরণকারীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। এরকম মনোভাবের অনেক উপকার ও কল্যাণ রয়েছে, যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পুরোপুরি জানে না।

ধৈর্য ধারণে কুরআনে বর্ণিত পুরস্কার

ইমাম আহমাদ বলেন, "আল্লাহ কুরআনে নব্বই জাগায় ধৈর্যের উল্লেখ করেছেন।" আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের আলোকে ধৈর্য-সম্পর্কিত কিছু আয়াত এখানে তুলে ধরব :

১. ধৈর্য সাফল্যের সাথে সম্পৃক্ত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ, ধৈর্য অবলম্বন করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। "[সূরা আলে ইমরান ৩ঃ২০০]

২. ধৈর্যশীলদের পুরস্কার দ্বিগুণ:

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا....

"তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দু-বার দেওয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছে...।"[সূরা আল ক্বসাস ২৮ঃ৫৪]

....إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"... আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি।" [সূরা যুমার ৩৯ঃ১০]

সুলাইমান ইবনু কাসীম বলেন: ধৈর্য ব্যতীত বাকি সব সৎকাজের প্রতিদান জানা আছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন

إِنَّمَا يُوَلَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

আমি ধৈর্যশীলদেরকে তাদের পুরস্কার অপরিমিতভাবে দিয়ে থাকি। "[সূরা যুমার ৩৯ঃ১০]

৩. ধৈর্য আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জনের পথ:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين َ

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" [সূরা আল আনফাল ৮ঃ৪৬]

আবূ আলি আদ-দাফকাক বলেন, "ধৈর্যশীলরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিতে উচ্চ মর্যাদা হাসিল করেছে। কেননা, তাঁরা আল্লাহর সঙ্গ লাভ করেছে।"

৪. ধৈর্যশীলদের পুরস্কার তিনগুণ (নিআমাত, রহমত ও হেদায়াত):

...وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون(َ

"...ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো। নিশ্চয়ই যারা বিপদকালে বলে থাকে, 'আমরা আল্লাহরই আর আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী'। এদের প্রতি রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও করুণা আর এরাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।"[সূরা আল বাক্বারাহ ২ঃ১৫৫-১৫৭]

একজন সালাফ বিপদে পড়ার পরার পর বলেন, আমি কেন ধৈর্য ধরব না, যেখানে আল্লাহ আমাকে ধৈর্যের জন্য তিনটি গুণ দানের অঙ্গীকার করেছেন, যার প্রতিটি দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম?"

৫. ধৈর্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ... ِ

"তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো...।" [সূরা আল বাক্বারাহ ২ঃ৪৫]

৬. ধৈর্য ও ইয়াকীন ধর্মীয় নেতৃত্বের পূর্বশর্ত:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

"আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ

অনুসারে সৎপথপ্রদর্শন করত যতদিন তারা ধৈর্য অবলম্বন করেছিল আর আমার আয়াত সমূহের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।"[সূরা আস সিজদাহ ৩২ঃ২৪]

৭. মুমিনদের ওপর ধৈর্যের আদেশ করা হয়েছে:

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"আর তুমি সবর করো। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফিকেই।"[সুরা আন নাহল ১৬ঃ১২৭]

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ....

"তুমি ধৈর্য ধরে তোমার প্রতিপালকের হুকুমের অপেক্ষায় থাকো...।" [সূরা আত তুর ৫২ঃ৪৮]

৮. আল্লাহ কর্তৃক ধৈর্যশীলতার প্রশংসা:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"আমি তাকে পেয়েছিলাম পূর্ণ ধৈর্যশীল, কতই-না উত্তম বান্দা, প্রকৃত (আল্লাহ) অভিমুখী। [সূরা সাদ ৩৮-৪৪]

কাজেই আল্লাহ আইয়ূব এ-এর দৃঢ়তা ও ধৈর্যশীলতার কারণে তাঁকে উত্তম বান্দা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে ধৈর্য ধরে না, সে নিকৃষ্ট বান্দা।

৯. ধৈর্যশীলতা প্রকৃত সাফল্যের পরিচায়ক:

আল্লাহ সাধারণভাবে বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে না, হকপন্থীদের সাথে থাকে না এবং সবর করে না, সে ব্যাপক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

"সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। "[সূরা আল আসর ১০১-১০৩]

নবী-রাসুল ধৈর্যের পরীক্ষা ও সবর

মানবজীবনে সুখ ও দুঃখ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কোরআনের ভাষ্যমতে মানুষকে নানাভাবে পরীক্ষা করা হয়। এমনকি যুগে যুগে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনকারী নবী-রাসুলরাও কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তারা ধৈর্যের সুউচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকা নবী-রাসুল ও মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সাআদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), মানুষের মধ্যে কে সব চেয়ে কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়? তিনি বলেন, প্রথমত নবীরা, অতঃপর যারা তাদের মতো। অতঃপর মানুষকে তার দ্বিনদার অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। কেউ শক্তভাবে দ্বীন

অনুসরণ করলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়ে থাকে। কেউ দ্বিনদারিতে শিথিল হলে তার পরীক্ষাও তেমন হয়।অতঃপর বান্দা একের পর এক বিপদে আক্রান্ত হতে থাকে। একপর্যায়ে সে পুরোপুরি গুনাহমুক্ত হয়ে ভূমিতে চলাফেরা করে।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৮)

নিম্নে কঠিন সময়ে কয়েকজন নবী ও রাসুলের ধৈর্যের পরীক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

১. মহানবীর ধৈর্যশীলতা

মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে অনাথত্বের দুঃখগুকষ্টের ওপর তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা এ ধরাধাম হতে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখগুকষ্টে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে তেমন কোনো শুভাকাক্সক্ষী না থাকা অবস্থায়ই তার জীবনের ৪০টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। কোরাইশের লোকরা তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে ও নানা বিদ্রƒপবাণে জর্জরিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) এসব কিছুর ওপর ধৈর্যধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। লোকরা আশানুরূপভাবে ঈমান না আনার কারণে তিনি পরিতাপ করতে থাকেন। লোকদের ঈমান না আনার বিষয়টি তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি পরিতাপ ও

আফসোস করার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘যদি তারা এ বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পেছনে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ শেষ করে ফেলবেন।’ (সুরা কাহফ : ৬)।

নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর

মহানবী (সা.)-এর জন্য দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ পথে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে বহু কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে; কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের পরিবার-পরিজন ও গোত্রসহ আবু তালিবের ঘাঁটিতে ৩ বছরের বন্দি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তিনি থেমে যাননি। সর্বাবস্থায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন; আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) সেজদারত ছিলেন। তার আশপাশে কোরাইশের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের ভুঁড়ি এনে মহানবী (সা.)-এর পিঠে ফেলে দিল। ফলে তিনি তার মাথা তুলতে পারলেন না। অবশেষে ফাতেমা (রা.) এসে তার পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, ‘হে আল্লাহ! কোরাইশদের এ দলের বিচার আপনার ওপর ন্যাস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিআ, শাইবা ইবনে রবিআ, উকবা ইবনে আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবনে খালফকে শাস্তি দিন।’ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার আগেই তার জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।’ (বোখারি : ৩১৮৫)।

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির ধৈর্য্য

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কোরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রাসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন। অম্লান বদনে বরদাশত করতেন কাফের বে-দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবু মুআইতকে দেখেছি, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলো, যখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসুল (সা.)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। আবু বকর (রা.) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার প্রতিপালক! যিনি তার দাবির স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' (বোখারি : ৩৬৭৮)।

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাইকেই বিভিন্ন বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, যুগে যুগে একত্ববাদের অনুসারী খুব কম লোকই হয়েছে। হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সব সময় সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হকের বিরোধী লোক বেশি থাকার কারণে সত্যের ধারক-বাহকদের ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশ্বনবী (সা.)-ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাকেও দ্বীনের পথে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ধৈর্যধারণ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?' তিনি

বললেন, 'নবীদের। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয়, তবে তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী হয়। এরপর বান্দা অহরহ বিপদাপদে পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২৩)। রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে তার পরীক্ষা হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতর। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি দিনরাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।' (তিরমিজি : ২৪৭২)।

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে 'শোকের বছর' বলে নামকরণ করেন। যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জনৈক কন্যা (যয়নাব) নবী (সা.)-এর কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, 'আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন।' তিনি বলে পাঠালেন, '(তাকে) সালাম দেবে ও বলবে, আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি নিয়ে যান। আর তাঁরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু

তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের অপেক্ষায় থাকে।' তখন তিনি তার কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সাদ ইবনে উবাদা, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তখন শিশুটিকে রাসুল (সা.)-এর কাছে তুলে দেয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার নিঃশ্বাসে মশকের মতো শব্দ হচ্ছিল! আর নবীজি (সা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ কি?' তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।' (বোখারি : ১২৮৪)।

মহানবী (সা.)-এর ঔরসজাত সন্তান ইবরাহিম (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তখনও তিনি কান্নাকটি ও বিলাপ না করে ধৈর্যধারণ করেন। অবশ্য দয়া ও করুণার অশ্রু তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।' আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন নবী-তনয় ইবরাহিম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় বাবা। রাসুল (সা.) ইবরাহিম (রা.)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেকবার) আমরা তার (আবু সায়ফের) বাড়ি গেলাম। তখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে রাসুল (সা.)-এর উভয় চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কাঁদছেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।' (বোখারি : ১৩০৩)।

২. মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান : প্রায় হাজার বছর ধরে নুহ (আ.) মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। কিন্তু খুবই সামান্যসংখ্যক মানুষ তার আহ্বানে সাড়া দেয়।

তবু তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও নির্যাতনের মধ্যে আল্লাহর পথের আহ্বান অব্যাহত রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তো নুহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের মধ্যে ৫০ বছর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেন, অতঃপর তাদের প্লাবন গ্রাস করে। কেননা তারা সীমালঙ্ঘনকারী ছিল। অতঃপর আমি তাকে ও যার নৌকাবাসীকে রক্ষা করেছি এবং বিশ্ববাসীর জন্য তাকে নিদর্শন করেছি।' (সুরা আনকাবুত, আয়াত : ১৪-১৫)

৩. ধৈর্যশীলদের প্রতীক যিনি : আইয়ুব (আ.) নবী ও রাসুলদের মধ্যে ধৈর্যশীল হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। পবিত্র কোরআনে তাঁর এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ১৮ বছর শারীরিক ও আর্থিক নানা সমস্যায় ভুগেও মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে, তিনি তাঁর রবকে ডেকে বলেন, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আপনি পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করুন, এতে গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয় রয়েছে। আমার অনুগ্রহে আমি তাকে তার পরিবার দান করেছি এবং তাদের মতো আরো, তা বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। আপনি এক মুষ্ঠি তৃণ নিয়ে আঘাত করুন এবং শপথ ভঙ্গ করবেন না, আমি তাকে ধৈর্যশীল হিসেবে পেয়েছি, কতই না উত্তম ছিলেন তিনি, তিনি ছিলেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সুরা সাদ, আয়াত : ৪১-৪৪)

৪. যিনি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু : শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর একত্ববাদের প্রচারে অবিচল ছিলেন। নিজ পরিবার থেকে শুরু করে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে তিনি তাওহিদের কথা বলে যান। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। এত কিছুর পরও তিনি স্থির ছিলেন এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন।

ফলে আল্লাহর নির্দেশে সেই জ্বলন্ত আগুন তাঁর জন্য শীতল হয়ে যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি হাজেরা (আ.) ও পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে মক্কার জনশূন্য প্রান্তরে রেখে আসেন। এমনকি তার প্রিয় পুত্রকে কোরবানি করতে বলা হয়। এসব পরীক্ষায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেন এবং খাঁটি বন্ধুর স্বীকৃতি লাভ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'দ্বিনের ক্ষেত্রে তার চেয়ে আর কে উত্তম যে সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, আল্লাহ ইবরাহিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ১২৫)

৫. দীর্ঘ অপেক্ষার পর সন্তানের সন্ধান : ইয়াকুব (আ.) প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ.)-কে হারিয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হন। তখন তিনি ধৈর্যকে নিজের একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর ওপর আস্থা রাখেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তারা (ইউসুফের ভাইয়েরা) তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে আনে, তিনি (ইয়াকুব আ.) বলেছিলেন, না, তোমরা এই ঘটনা সাজিয়েছ, অতএব পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম, তোমরা যা বলছ এই ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮)

অতঃপর ইয়াকুব (আ.) দ্বিতীয় সন্তানকে হারান। তিনি নিজের সব দুঃখ-ব্যাথাকে আল্লাহর কাছে অর্পণ করেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তিনি বললেন, আফসোস ইউসুফের জন্য, শোকে তার দুই চোখ সাদা হয়ে পড়ে, তিনি খুবই কষ্টে ছিলেন।...তিনি বলেন, আমি আমার দুঃখ ও বেদনা আল্লাহর কাছে আবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তুমি জানো না। হে আমার সন্তানরা, তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে অনুসন্ধান কোরো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইয়ো না। কেননা অবিশ্বাসী ছাড়া কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয় না।' (সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৬-৮৭)

৬. মাছের উদোরে আল্লাহকে স্মরণ : ইউনুস (আ.) দীর্ঘ সময় মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের কথা বলেন। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ তার মানেনি। নিরাশ হয়ে তিনি তাদের ছেড়ে চলে যান। অতঃপর নানা ঘটনার পর তাঁর আশ্রয় হয় একটি মাছ উদরে।

সেখানে তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত অতবাহিত করেন। এ সময় তিনি শুধু আল্লাহর কাছে অনুনয় করে দোয়া করতেন। ইরশাদ হয়েছে, ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। স্মরণ করুন, তিনি পালিয়ে একটি ভর্তি নৌকায় যান। অতঃপর লটারিতে অংশ পরাজিত হন। তাকে একটি বড় মাছ গিলে ফেলে তখন তিনি নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি আল্লাহর তাসবিহ না পড়লে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতেন।' (সুরা সাফফাত, আয়াত : ১৩৯-১৪৪)

তাই পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-কে তার কথা উল্লেখ করে তার মতো ধৈর্যহারা হতে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি মাছাওয়ালার মতো হবেন না, যখন তিনি দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিলেন। তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছলে তিনি লাঞ্ছিত হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতেন।' (সুরা কলম, আয়াত : ৪৮)

কিভাবে পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে পারি

যে উপায়গুলোর মাধ্যমে আপনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করতে পারেন:

১. অপেক্ষমাণ উত্তম পুরস্কারের কথা চিন্তা করা: আপনার জন্য পুরস্কার অপেক্ষা করছে-এটা যতবেশি বিশ্বাস করতে শিখবেন, ধৈর্যধারণ করাটা আপনার জন্য ততই সহজ হয়ে উঠবে। যদি পুরস্কার লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাস না থাকতো, তাহলে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো স্বপ্ন ও লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব হতো না। মানুষের স্বভাব হলো সবকিছুতেই সে নগদ প্রাপ্তি চায়, কিন্তু বিচক্ষণতা ও পরিপক্কতা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ফলাফল অর্জনে উৎসাহিত করে। চিন্তার এই দূরদর্শিতা সংকট মোকাবিলায় টিকে থাকতে আমাদের ধৈর্যশক্তিকে মজবুত করে, চাই এতে ইচ্ছের দখল থাক বা না থাক।

২. সুদিনের আশা রাখা: এ আশা আমাদের অবিলম্বে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিরসন করে মুক্তির পথ দেখায় ও মনে সান্ত্বনা জোগায়।

৩. আল্লাহর দেওয়া অফুরন্ত নিআমাত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা: আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপকতা অনুভব করতে পারলে বর্তমানের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে ধৈর্যধারণ আমাদের জন্য সহজতর হয়। কারণ, বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের অসীম সাগরের তুলনায় একটি বৃষ্টিবিন্দু সমতুল্য।

৪. আল্লাহ্ আগে যে সমস্ত নিআমাত দিয়েছেন সেসবের কথা চিন্তা করা: এটা আমাদের প্রতি আল্লাহর মমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সুদিনের প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে দৃঢ় করে।

কীভাবে ধৈর্য বাড়াতে পারি

যেহেতু ধৈর্যধারণের আদেশ করা হয়েছে তাই আল্লাহ আমাদের ধৈর্যশীলতা অর্জনের এবং ধৈর্যের বাতাবরণ মজবুত করার উপকরণ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের এমন কিছু করতে আদেশ করেননি, যা বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি জানাননি। তিনি নিরাময় ছাড়া ব্যাধি দেননি এবং (মৃত্যুরোগ ছাড়া যে-কোনো) রোগব্যাধিতে ওষুধ সেবনে সুস্থতা লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ধৈর্যের পথটা যদিও অমসৃণ, কিন্তু এ পথে চলাটা একেবারে অসাধ্য কিছু নয়। ধৈর্য মূলত দুটি জিনিসের সমন্বয়ে অর্জন করা সম্ভব: যার একটি হলো **জ্ঞান**, অপরটি **আমল বা কর্ম।** আর এই দুটি উপাদানে রয়েছে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের আরোগ্য। জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় সবসময়ই অপরিহার্য।

i.জ্ঞান

কল্যাণকর, উপকারী, উপভোগ্য ও কামালিয়াতের কী কী বিষয়ের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন এবং ক্ষতিকর, অপকারী ও লোকসান করার মতো কী কী কাজ তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, তা জানার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি যখন এসব বুঝতে পারে এবং এর সাথে অত্যধিক সততা, সুউচ্চ হিম্মত, সম্মানবোধ ও মানবতাবোধ অর্জন করতে পারে এবং ওপরে উল্লেখিত দুই জ্ঞানকে একত্র করে আমল করতে পারে, তখন সে সবর অর্জন করতে সক্ষম হবে। তখন তার কাছে ধৈর্যের তিক্ততা মধুর লাগবে এবং ধৈর্যের কষ্ট আনন্দের উপঢৌকন মনে হবে।

ii.ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা

ধর্ম ও মূল্যবোধের সাথে কামনা-বাসনার চলমান যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমারা কিছু হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি। যেমন:

১. গুনাহের সময় আল্লাহর শক্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আল্লাহ্ সব দেখেন, সব শোনেন। যার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব উপস্থিত থাকবে, সে নিজেকে

গুনাহে নিয়োজিত করতে পারবে না।

২. আমরা যদি দাবি করি, আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের উচিত ভালোবাসার খাতিরে তাঁর অবাধ্য না হওয়া; কারণ, যে যাকে ভালোবাসে সে তার কথা রাখে। যারা আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে আল্লাহর চোখে তাদের মর্যাদা শ্রেষ্ঠতম স্থানে অধিষ্ঠিত; আল্লাহকে ভালোবেসে যারা তাঁর ইবাদাত করে তাদের মতোন। আল্লাহকে ভালোবেসে অন্যায় থেকে বিরত থাকা আর তাঁর শাস্তির ভয়ে অন্যায় থেকে বিরত থাকার মধ্যে অনেক পার্থক্য।

বিজয়ের জন্য চাই ধৈর্য ও সংহতি

ধৈর্য ও দৃঢ়তা—শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলির মধ্যে অন্যতম। মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনের স্থানে স্থানে মহান আল্লাহ তাআলা নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। ধৈর্যের আরবি হলো ‘সবর’। সহিষ্ণুতার আরবি হলো ‘হিলম’। সবর ও হিলম শব্দ দুটির মধ্যে কিঞ্চিৎ তফাত রয়েছে। সবর বা ধৈর্য অপেক্ষা হিলম তথা সহিষ্ণুতা উন্নততর। তবে এ উভয় শব্দ কখনো কখনো অভিন্ন অর্থে তথা উভয় অর্থেও একে অন্যের স্থানে ব্যবহৃত হয়। হিলম তথা সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল।’ (সুরা-২২ হজ, আয়াত: ৫৯) সবর তথা ধৈর্যের বিষয়ে হজরত আইয়ুব (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। সে কত উত্তম বান্দা! সে ছিল আমার অভিমুখী।’ (সুরা-৩৮ সদ, আয়াত: ৪৪)

‘নিশ্চয় ইহাতে তো নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক অতি ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।’ (সুরা-১৪ ইব্রাহিম, আয়াত: ৫)

সফলতার জন্য চাই ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সংহতি। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কোরআন কারিমে বলেন, ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করো এবং সুসম্পর্ক স্থাপনে আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে অবিচল থাকো, আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।’ (সুরা-৩ আল–ইমরান, আয়াত: ২০০)

বিশ্বাসী মুমিনের সফলতার জন্য ধৈর্য ও দৃঢ়তা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পর একে অন্যকে সত্যের উপদেশ ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩)

‘হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৫৩) ‘হে মুমিনগণ! যদি তোমরা

আল্লাহকে সাহায্য করো (আল্লাহর হুকুম পালন করো) তবে তিনি তোমাদের (প্রতিশ্রুত) সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন (প্রতিশ্রুত বিজয় দান করবেন)।' (সুরা-৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত: ৭)

যে দু'আয় সহজ হবে ধৈর্য্যধারণ

اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাব্বিতনি, ওয়াজআলনি হা-দিয়াম মাহদিয়্যা। অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে স্থির রাখুন এবং আমাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতকারী বানিয়ে দিন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (সুরা তাগাবুন ১১)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহ তার অন্তরে বিশ্বাসের পথনির্দেশ দেন। ফলে বুঝতে পারে বিপদের কারণে সে ভুল করেনি। তার ভুলের কারণে বিপদ হয়নি। বরং তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ছিল। এভাবে মুমিন অনুতাপ, অনুশোচনা ও মানসিক কষ্ট থেকে বেঁচে যায়। (তাফসিরে ইবনে কাসির। যখন কেউ মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী হয় তখন সে বিপদে ধৈর্য ও প্রশান্তি খুঁজে পায় এভাবে, সে চিন্তা করে এতে মহান স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তিনি আবশ্যই কোনো কল্যাণ রেখেছেন। ফলে অশান্ত ও অস্থির হৃদয় প্রশান্ত হয়, স্বস্তি খুঁজে পায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনলাম, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তার কোনো ক্ষতি ও কোনো অন্যায়ের আশঙ্কা থাকবে না। (সুরা জিন ১৩)।

হযরত জারির রা. বলেন, হজরত রাসুলুল্লাহ সা. তাকে বলেছেন, তুমি কি জুল-খালাসাকে ধ্বংস করে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? সেটা ছিল একটি মূর্তি। মানুষ এর পূজা করত। সেটাকে বলা হতো 'ইয়েমেনি কাবা।' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমাকে বুকে জোরে একটা থাবা মারেন এবং বলেন (দোয়া করলেন), 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে স্থির রাখুন এবং তাকে হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দিন'

তারপর আমি আমার গোত্র আহমাসের ৫০ জন যোদ্ধাসহ বের হলাম। আমি ওই মূর্তির কাছে গিয়ে সেটা জ্বালিয়ে ফেললাম। এরপর আমি নবী সা.-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রসুল, আল্লাহর কসম! আমি জুল-খালাসাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পাঁচড়াযুক্ত উটের মতো করে আপনার কাছে এসেছি। তখন তিনি আহমাস গোত্র ও তার যোদ্ধাদের জন্য দোয়া করেন। (সহীহ বুখারি ৬৩৩৩)

বালা মুসিবত কামনা করা অনুচিত

দুনিয়াবি বিপদ-আপদের নানা উপকারিতা, পুরস্কার এবং এর বিনিময়ে পরকালের শাস্তি মাফের মহা-সুযোগ দেখে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, দুনিয়াবি বিপদ ভোগ-করা এবং আল্লাহ যাতে বিপদে ফেলেন এমন প্রার্থনা করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু মুসলিমদেরকে বিপদ চেয়ে দুআ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ:
প্রথমত, বিপদসংকুল অবস্থায় যে-কোনো ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত অস্বীকার করতে পারে, হয়ে যেতে পারে অবিশ্বাসী। আর তা ছাড়া নিজের গুনাহের সম্পূর্ণ ভার এই দুনিয়াবি জীবনে বহন করা আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভবপর হবে না।তাই মুসলিমদের উচিত আল্লাহর দয়া গ্রহণ করা এবং আল্লাহর কাছে নিজের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বিপদ চাওয়া কখনোই উচিত নয়। আনাস রাঃ বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ একবার এক মুসলিমকে দেখতে গেলেন, সে

এতই দুর্বল ছিল যে মুরগির বাচ্চার মতো (চিকন) হয়ে গিয়েছিল। রাসূল তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো বিশেষ দুআ করেছ অথবা বিশেষ কিছু চেয়েছ (যার ফলে তুমি এমন হয়ে গেলে)?"

সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি দুআ করেছি যে, হে আল্লাহ! তুমি পরকালে আমার জন্য যেসব শাস্তি রেখেছ, তা আমাকে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দাও।" রাসূলুল্লাহ তখন বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না। বরঞ্চ তোমার এ কথা বলা উচিত ছিল:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও " কল্যাণ দান করো এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।"খি

তারপর তিনি আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির সুস্থতার জন্য দুআ করলেন আর আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন।"[সহীহ মুসলিম]

রেফারেন্স

https://www.prothomalo.com/religion/%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF

কোরআনে নবী-রাসুলদের ধৈর্যের পরীক্ষা (kalerkantho.com)

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/prophet-life/156428/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE

https://www.somoynews.tv/news/2024-01-07/R0LYNQv6

https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/07/25/1302146

বইঃ বিপদ যখন নিয়ামাত

লেখকঃ

শাইখ মূসা জিবরীল, উসতাদ আলি হাম্মুদ, উসতাদা শাওয়ানা এ. আযীয

বইঃ সবর ও শোকর

'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া-যাখিরাতুশ শাকিরীন'

লেখকঃ

মূল: ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ

অনুবাদ: রিয়াজ মাহমুদ হামিদ সিরাজী

সম্পাদনা: মানযূরুল কারীম